শকুন্তলা ও মিরান্দা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর প্রবন্ধ 'শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেসদিমনা', যা মূলত মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের শকুন্তলা এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'দ্য টেম্পেষ্ট' নাটকের মিরান্দা চরিত্র দুটির একটি তুলনামূলক তাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—এর আলোকে শকুন্তলা ও মিরান্দা চরিত্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের বিস্তারিত আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো-

সাদৃশ্য:

১. জন্মপরিচয় ও পটভূমির সাদৃশ্য:

ক) উভয়েই ঋষিকন্যা: বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, শকুন্তলা ও মিরন্দা উভয়েই ঋষিকন্যা। শকুন্তলার পালক পিতা মহর্ষি কণ্ব এবং মিরন্দার পিতা প্রস্পেরো—উভয়েই ঋষিকর্ষি ও রাজর্ষি তুল্য মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব।

খ) অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত: উভয়েই ঋষি-পালিতা এবং জন্মের পর বা শৈশবে অমানুষিক বা দিব্য শক্তির দ্বারা রক্ষিত ও প্রতিপালিত হয়েছেন। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা এবং শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা।

গ) অরণ্যবাসিনী ও উদ্যানলতা বিজয়ী: উভয়েই মনুষ্যালয়ের কোলাহল থেকে দূরে অরণ্য বা তপোবনের নির্জন প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিতা। তাঁদের প্রাকৃত সৌন্দর্যের কাছে নগর বা উদ্যানলতা যেন সম্পূর্ণ ম্লান ও পরাভূত।

২. প্রাতিস্বিক সৌন্দর্য ও লোকালয়ের কালিমামুক্ততা:

ক) সহজ সরলতা: উভয়েই তপোবনের মুক্ত বাতাসে বেড়ে ওঠায় মানবসমাজের কৃত্রিমতা, কুটিলতা, এবং লৌকিক বিলাস-বিভ্রম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

খ) সমাজের কালিমাহীন রূপ: সমাজে বসবাসকারী নারীদের মধ্যে প্রায়ই একধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি দেখা যায়—কে আমাকে ভালোবাসবে, কে আমাকে সুন্দর বলবে, কিংবা কেমন করে পুরুষকে জয় করা যাবে—এই ধরনের সলজ্জ বা ছলনাময়

কামনার কালিমা তাদের মনে থাকে। কিন্তু শকুন্তলা ও মিরন্দা উভয়েই লোকালয়ের বাইরে বর্ধিতা হওয়ায় তাঁদের সরলতা ও মাধুর্য সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক, কালিমাহীন ও শুভ্র।

৩. তপোবনের নিখাদ ও নিঃস্বার্থ স্নেহবন্ধন:

ক) প্রকৃতি ও প্রাণিকূলের সঙ্গে একাত্মতা: শকুন্তলা বল্কল পরিধান করে ক্ষুদ্র কলসি হাতে নিয়ে গাছের গোড়ায় জল সেঁচন করতেন। নব মল্লিকা, সহকার বৃক্ষ এবং মাতৃহীন হরিণশিশুর প্রতি তাঁর যে গভীর ভগিনী, ভ্রাতৃ ও পুত্রস্নেহ ছিল, তা অকৃত্রিম। পতিগৃহে যাত্রাকালে তাঁদের ছেড়ে যাওয়ার সময় শকুন্তলা অশ্রুমুখী ও বিবশা হয়ে পড়েছিলেন।

খ) প্রাকৃতিক জীবনের অনুষঙ্গ: পক্ষান্তরে, মিরন্দাও প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠায় পশুপাখি ও সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবন কাটিয়েছেন। উভয়ের হৃদয়েই কোনো রকম কুৎসিত সংস্কার বা স্বার্থপরতার লেশমাত্র নেই।

বৈসাদৃশ্য:

১) জন্মস্থান, প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব:

শকুন্তলার জন্ম এবং লালন-পালন বনের পবিত্র কোলে, আশ্রমের শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশে। তিনি তরুলতা, মৃগশাবক এবং ঋষিকন্যাদের সঙ্গে আনন্দময় ও আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে বড় হয়েছেন। ঋষি কান্বের স্নেহচ্ছায়া এবং প্রকৃতির উদারতা তাঁর চরিত্রের ভিত তৈরি করেছে।

অন্যদিকে মিরান্দা জন্ম ও প্রতিপালন পেয়েছেন জনমানবহীন এক দ্বীপে, যেখানে তিনি কেবল তার পিতা প্রস্পরো এবং রাক্ষস প্রকৃতির ক্যালিবান ও পরি আসিয়েলের সংস্পর্শে এসেছেন। এই দ্বীপটিও নির্জন ও প্রাকৃতিক, কিন্তু এটি শকুন্তলার আশ্রমের মতো সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দীক্ষাপূর্ণ ছিল না।

২) সংস্কার ও লজ্জাবোধের বৈসাদৃশ্য:

বঙ্কিমচন্দ্র এই দুটি চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখিয়েছেন তাদের লজ্জাবোধ এবং সমাজপ্রদত্ত সংস্কারের ক্ষেত্রে। শকুন্তলা সম্পূর্ণ তপোবনে থাকলেও সমাজপ্রদত্ত সংস্কার ও লৌকিক লজ্জার গণ্ডি তাঁর চরিত্রের মধ্যে প্রবলাভাবে বিদ্যমান। তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হন এবং সখীদের সম্মুখে নিজের হৃদ্গত প্রণয় সহজে ব্যক্ত করতে পারেন না। তাঁর প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকে, কেবল চোখের চাউনি বা সখীদের অনুভবের মাধ্যমেই তা প্রকাশিত হয়।

মিরন্দার কোনো রকম সমাজদত্ত সংস্কার বা লোকশিক্ষার বালাই ছিল না। তিনি তাঁর জনক প্রস্পেরো ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে কখনো দেখেনইনি। তাই প্রথম যখন তিনি রাজপুত্র ফার্দিনান্দকে দেখলেন, তখন লৌকিক লজ্জা না থাকায় তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ ছাড়াই পিতার সম্মুখে তাঁর রূপের প্রশংসা করলেন এবং সোজাসাপ্টা ভাষায় নিজের ভালো লাগার কথা ব্যক্ত করলেন।

৩) প্রণয় প্রকাশের ধরণ ও বাচনভঙ্গির বৈসাদৃশ্য :

দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ ছিল এক ধরণের লুকোচুরি খেলা—গাছের আড়ালে লুকানো, সখীকে জড়িয়ে ধরা কিংবা সামান্য চাতুরী করা (যেমন: মৃণাল বলয় খসে পড়ার ছলে দাঁড়িয়ে পড়া)। দুষ্মন্তের মহাবৃক্ষের বিশালতার ছায়ায় শকুন্তলা যেন প্রস্ফুটিত হতে গিয়েও পুরোপুরি মুখ খুলতে পারেননি; সেখানে প্রণয় যেন রাজক্রীড়ার মতো কিছুটা চাপা পড়ে গেছে।

মিরন্দার প্রণয় প্রকাশে কোনো লুকোচুরি নেই। বনের পাখির মতো বা সন্ধ্যার বাতাসে ফুল ফোটার মতো তাঁর প্রণয় অকপট ও স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি ফর্দিনান্দকে প্রথম দেখেই অকপটে বলেন—

“আমি যে পুরুষদের দেখেছি, ইনি তাঁদের মধ্যে তৃতীয় এবং প্রথম যার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি।”

এমনকি নিজের লজ্জাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি ফর্দিনান্দকে সরাসরি বলেন যে, তুমি যদি আমাকে বিয়ে কর তবে আমি তোমার স্ত্রী, আর না করলে তোমার দাসী হয়ে থাকব।

৪) পিতৃভক্তি ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব:

শকুন্তলার জীবনে পিতৃভক্তি এবং গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা অত্যন্ত গভীর। পালক পিতা ঋষি কান্বের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি এবং আশ্রমের নিয়মানুবর্তিতা তার চরিত্রের অন্যতম প্রধান ভূষণ। দুষ্মন্তের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও তার আচার-আচরণে ভারতীয় নারীর ঐতিহ্যগত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়।

মিরান্দার পিতৃভক্তি প্রবল হলেও, প্রস্পরোর প্রতি তাঁর আনুগত্যের পাশাপাশি ফার্দিনান্দের প্রতি আকর্ষণ একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। প্রস্পরো যখন ফার্দিনান্দকে পরীক্ষা করার জন্য কঠোর আচরণ করছিলেন, তখন মিরান্দা পিতার বিরুদ্ধে গিয়েও ফার্দিনান্দের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন এবং তার নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

৫) নায়কদের চরিত্রের প্রভাব ও তার তারতম্য:

দুষ্মন্ত হলেন সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি, মহেন্দ্রসখ ও প্রতাপশালী রাজা। তাঁর রাজকীয় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-গৌরবের বিশাল ছায়া তপোবনবাসিনী শকুন্তলাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, শকুন্তলা সেখানে কেবল করিশুণ্ডের পদ্মমাত্রের ন্যায় এক বালিকার চঞ্চলতা ও ভয়ে আচ্ছন্ন ছিলেন। সভাতলে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরই কেবল শকুন্তলার মধ্যে প্রকৃত রমণীর গাম্ভীর্য ও তেজ ফুটে উঠেছে।

অন্যদিকে, ফর্দিনান্দ মিরন্দার প্রায় সমবয়সী ও সমযোগ্য। ফলে মিরন্দার প্রণয়লাবণ্য বা বাচনভঙ্গি কোনো রাজা-বাদশার প্রতাপে চাপা পড়ে যায়নি; বরং শেক্সপিয়রের নাটকে মিরন্দার প্রণয়সম্ভাষণ জুলিয়েটের মতো বিশ্বখ্যাত প্রণয়ভাষণের সমকক্ষ এক মহিমান্বিত রূপ লাভ করেছে।

৬) শিক্ষা এবং মানসিক গঠন:

শকুন্তলা বনের মানুষ হলেও তিনি ভারতীয় ঋষি সংস্কৃতির তপোবন-সভ্যতার নিখুঁত ফল। সেখানে গুরুজনের সেবা, অতিথি সৎকার, ধর্মানুষ্ঠান, এবং নীতিবোধের এক সুদৃঢ় সংস্কার তার মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তিনি শুধু প্রকৃতির সন্তান নন, বরং ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির নীতি ও কর্তব্যের শিক্ষায় দীক্ষিত।

মিরান্দার কোনো প্রচলিত সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। পিতা প্রস্পরো তাকে নিজের হাতে যা শিখিয়েছেন, তাই তার সম্বল। মিরান্দার মনে কোনো পূর্বসংস্কার বা জটিল সামাজিক বিধিনিষেধের প্রভাব নেই; তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা এক মুক্ত ও আদিম সরলতার প্রতিমূর্তি।

৭) সামাজিকতা ও পরিণতিবোধ :

শকুন্তলা হলেন এমন একজন নারী, যিনি সমাজ-সংসার, পতিগৃহের দায়িত্ব, রাজরানীর গৌরব এবং পরবর্তীতে চরম দুঃখ-দুর্দশা ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি সমাজবদ্ধ মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার।

মিরান্দা ব্যক্তিগত ও সংকীর্ণ সামাজিক পরিমণ্ডলের বাইরে এসে এক ঝটকায় রাজবংশীয় সভ্যতার আলোয় প্রবেশ করেন। তাঁর জীবন নাটকের শেষে দ্বীপের নির্জনতা ছেড়ে ইতালির জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে চলেছে, যেখানে তিনি এক নতুন পৃথিবীর মুখোমুখি হবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, শকুন্তলা হলেন ভারতীয় আদর্শের মূর্ত প্রতীক—যিনি স্নেহ, করুণা, লজ্জা, ধর্ম এবং তপোবনের শান্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছেন। পক্ষান্তরে, মিরান্দা হলেন শেক্সপীয়রের কল্পনায় সৃষ্ট এমন এক নারী, যিনি কোনো কৃত্রিম সমাজ বা সংস্কারের আবডালে না থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত প্রকৃতির মাঝে লালিত হয়েছেন। শকুন্তলার মধ্যে রয়েছে এক গভীর আত্মিক গাম্ভীর্য ও পরিপক্কতা, আর মিরান্দার মধ্যে রয়েছে স্বর্গের মতো নির্মল সরলতা ও অকপট উন্মুক্ততা।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই তুলনামূলক আলোচনা কেবল দুটি নাট্যচরিত্রের বহিঃবৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক রূপ নয়, বরং এটি পূর্ব ও পশ্চিমের জীবনদর্শন, সংস্কৃতি এবং নারীচরিত্রের তুলনামূলক রূপরেখা, যা আজও সাহিত্য সমালোচকদের মুগ্ধ করে।